

হাসব, না হাসব না?

মৈ ত্রী শ ঘ ট ক

আমাদের একজন মাস্টারমশাই ছিলেন, তিনি ক্লাসে মাঝে মাঝে মজার গল্প বলতেন। তাঁর অনেক গল্পই সুকুমার রায়ের ‘হাসির গল্প’-এর পোস্টাপিসের বড়বাবুর গল্পগুলোর মতো— তিনি বলে যতটা মজা পেতেন, শুনে ততটা হাসি পেত না আমাদের।

তা-ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত আমরা অল্প অল্প হাসতাম। কিন্তু আমাদের এক কিঞ্চিৎ খ্যাপা বন্ধু ছিল, সে একবার এ রকম একটা গল্প শোনার পর খুব সরল ও সিরিয়াস মুখ করে আপাত আন্তরিক ভাবে জিজ্ঞেস করল, ‘স্যর, হাসব?’ স্যরের প্রত্যুত্তর, ‘অবান্তর কথা বোলো না।’ এই বিনিময় শুনে আমাদের গল্পটির থেকে অনেক বেশি হাসি পেয়েছিল।

সে দিন মনে হয়েছিল, সুকুমার রায় তো ‘হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই’ বলেই খালাস, কিন্তু কীসে কার হাসি পায় আর কীসে পায় না, এটা নেহাতই সরল ব্যাপার নয়। ননসেন্স লিমেরিক বা আজগুবি গল্পে ফিক করে হেসে ফেলি, কিছু রসিকতায় হেসে গড়িয়ে পড়ি, আবার কোনও কোনও রসিকতায় হাসি পায় না, এমনকী বিরক্তি বা রাগ হয়, আবার বোকা রসিকতা (যাকে পুয়োর জোক বা পিজে বলে) শুনে খুকখুক করে হাসি যতটা না রসিকতাটায়, তার থেকে বেশি যিনি করেছেন তাঁর রসবোধে। এ তো গেল নানা রকম রসিকতা বা মজার ঘটনায় আমাদের প্রতিক্রিয়া। আবার আমরা নিজেরা আমাদের নিজস্ব সামাজিক বৃত্তে কোনও রসিকতা করলে কোনটায় সবাই হো হো করে হাসবে, কোনটায় কেউ চটে যাবে বা দুঃখ পাবে, সেই চিন্তা আছে। তা ছাড়া, যদি বৃহত্তর পরিসরে সেই রসিকতা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে (যেমন, সমাজমাধ্যমে) তখন তা সরকার বা কোনও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের রোষদৃষ্টি আকর্ষণ করতে

আপনার দৈনন্দিন প্রয়োজনে দ্রুত খোঁজ-খবর পান



www.**khonj.in**

বিনামূল্যে আপলোড করুন আপনার শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

কথা বলুন : **9233 44 45 46**

থার্ড পার্টি টু-হুইলার ইন্স্যুরেন্স **699/-** থেকে শুরু

আধার, PAN, পাসপোর্ট সহ বিভিন্ন সরকারি নথিতে নামের বানান ভুল ?

ঘরে বসে সঠিক পরামর্শ নিন।



শুধু প্রচার করে না, প্রসার ঘটায়

9233 44 45 46

পারে বা কোনও গোষ্ঠীর অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে বলে সেই নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা বিতর্ক হতে পারে, এই সব আশঙ্কাও আছে। আর সত্যিই, এ রকম উদাহরণ প্রচুর যেখানে কোনও রসিকতা করার জন্যে কাউকে কারাবাসে যেতে হয়েছে বা চাকরি খোয়াতে হয়েছে। এই সমস্যা চিরকালই ছিল, এখন দিবারাত্র সক্রিয় বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং সমাজমাধ্যমের রমরমার ফলে, এ ধরনের ঘটনা এখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে সামাজিক চাপে 'বাতিল' (cancel) হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, যা খানিকটা আগেকার দিনে একঘরে করার মতো। তাই খানিকটা শিব্রাম চক্রবর্তীর ধরনে বলা যেতে পারে, হাসি ব্যাপারটা নেহাতই হাসাহাসির বিষয় নয়। স্বাদের তুলনা টানলে অধিকাংশ রসিকতার মধ্যেই একটা অম্লরস থাকে। কখন সেটা মুখরোচক আর কখন তা অ্যাসিডের মতো জ্বালা ধরায়, এটা নির্ভর করছে কে সেই রসিকতা করছে, তার নিশানা কার উদ্দেশে এবং কার মনোরঞ্জনের জন্যে সেটা করা হচ্ছে। বন্ধুদের মধ্যে যে খুনসুটি হাসিঠাট্টার বিষয়, অপরিচিত লোকের সঙ্গে একই জিনিস করলে সংঘাত বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, আর র‍্যাগিংয়ের ক্ষেত্রে তা নেহাতই ক্ষমতার প্রদর্শন। আর আছে মাত্রার প্রশ্ন, কলার খোসায় পা পিছলে আছাড় খেয়েছে দেখলে কারও হাসি পেতে পারে কিন্তু সে গুরুতর চোট পেলে তখন তা আর হাসির বিষয় থাকে না।

আসলে কৌতুকরসের মূলে আছে অসঙ্গতি। গতানুগতিক ঘটনাপ্রবাহ বা চিন্তাধারার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কোনও অসামঞ্জস্য বা অদ্ভুত কোনও মোচড়, যা চেনা ছককে ভেঙে হাসির জন্ম দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'কৌতুকহাস্য'-এ এই নিয়ে আলোচনা আছে, আরও অনেক দার্শনিকও এ নিয়ে চিন্তা করেছেন। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' (যা আবার ঘটনাচক্রে রাজশেখর বসুকে উৎসর্গ করা, যাঁর পরশুরাম ছদ্মনামে লেখা রম্যরচনার আলোচনায় পরে আসছি), বা ১৯২৩ সালে প্রকাশিত সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' ছড়ার বইগুলির নামগুলির মধ্যেই কৌতুকরসের এই অদ্ভুত বা উদ্ভট বা আজগুবি দিকটা ধরা পড়েছে। আর এই বইগুলির কিছু ছড়ার উদাহরণ ভাবুন— 'ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির/ পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়/ শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়/ হাঁড়িগুলো রাখে আল্‌নায়' ('ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির') বা 'কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা/ ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?/ রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?/ পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা?' ('বোম্বাগড়ের রাজা')। একটু তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে যে, এই উদাহরণগুলোতে যে মজা তার কোনও সুনির্দিষ্ট নিশানা নেই। চারপাশের জগতে যে গতানুগতিক ধারা তা উল্টেপাল্টে দিলে যে আজগুবি ব্যাপার হয়, সেটাই তার সারবস্তু। সেই অর্থে এগুলোর মধ্যে যে কৌতুকরস

এ রকম উদাহরণ প্রচুর যেখানে কোনও রসিকতা করার জন্যে কাউকে কারাবাসে যেতে হয়েছে বা চাকরি খোয়াতে হয়েছে। এই সমস্যা চিরকালই ছিল।

তা নেহাতই নির্মল। কিন্তু 'আবোল তাবোল'-এর সব ছড়া কিন্তু এই ছাঁচে পড়ে না। অনেকগুলো ছড়ার ক্ষেত্রে কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক সমালোচনা নিহিত আছে, কিন্তু তা খুবই সূক্ষ্ম এবং তার কারণেই হয়তো একটু তলিয়ে না ভাবলে খেয়ালই হয় না। 'আবোল তাবোল'-এর 'মাসি গো মাসি' ছড়ার প্রথম পঙ্‌ক্তিগুলোতে এই উল্টোপাল্টা করে দেওয়ার দৃষ্টান্তগুলো আক্ষরিক (যেমন, 'নিম গাছেতে হচ্ছে শিম্/ হাতীর মাথায় ব্যাঙের ছাতা/ কাকের বাসায় বগের ডিম।।') কিন্তু বাড়তে বাড়তে শেষ পঙ্‌ক্তিগুলোতে তা আমাদের হাসাতে বাধ্য— 'বল্‌ব কি ভাই হুগ্‌লি গেলুম,/ বল্‌ছি তোমায় চুপি-চুপি—/ দেখতে পেলাম তিনটি শুয়োর/ মাথায় তাদের নেইকো টুপি।।'[১] শুয়োরেরা টুপি কেন পরবে, আর তারা টুপি পরে নেই দেখে সেটা গোপনে বলারই বা কী আছে! হয়তো এখানে রসিকতার আসল লক্ষ্য হলো প্রচলিত আচার থেকে অল্প কোনও বিচ্যুতি হলে তা নিয়ে আড়ালে পরনিন্দা-পরচর্চার প্রবণতা। সামাজিক আচারের থেকে বিচ্যুতিও এক ধরনের অসঙ্গতি এবং তাতে কারও হাসি পেতেই পারে, কিন্তু এই অসঙ্গতি মূলত পর্যবেক্ষকের চোখে এবং বিচারধারায়, আর এ ক্ষেত্রে ছড়াটির শেষ পঙ্‌ক্তিগুলোর কৌতুকের মূল লক্ষ্য সেটাই। একজন শিশুর বড়দের জুতো পরে হাঁটা বা বড়দের মতো হাবভাব করা অথবা 'গোল্ড রাশ' ছবিতে চার্লি চ্যাপলিনের যত্ন করে জুতো রান্না করে খাওয়ার মধ্যে যে অসঙ্গতি এবং তার থেকে যে কৌতুকবোধ হয় তার ভিত্তি অনেক বস্তুনিষ্ঠ। কিন্তু কী পরব বা কী খাব তা নিয়ে মূল ধারার যে প্রত্যাশা এবং তার থেকে বিচ্যুতি হলে যে নিন্দা বা পরিহাস করার প্রবণতা, সেটাই তো কৌতুকের বিষয় হতে পারে— হুগলির শুয়োরদের টুপি না-পরা নিয়ে ফিসফিস করে আলোচনা করার মতো। এই দ্বিতীয় ধরনের অসঙ্গতির উৎস বর্ণিত ঘটনায় নয়, বরং দর্শকের চোখে, তাই কে দেখছেন, কাকে দেখেছেন, আর কোন চোখে দেখছেন, সেটাই ঠিক করে দেয় রসিকতাটার নিশানা আর অম্লরসের তীব্রতা— কখন তা নির্মল হাস্যরস আর কখন তা ব্যঙ্গ।

'আবোল তাবোল'-এর অন্য অনেক ছড়ায় বা 'হ য ব র ল'-র অনেক চরিত্র ও ঘটনাবলির মধ্যে ব্যঙ্গের তিরের লক্ষ্য আরও স্পষ্ট। যেমন 'ট্যাঁশ গরু'-তে তা হলো সাহেবদের থেকেও বেশি সাহেবিয়ানার যে প্রবণতা কিছু মানুষের মধ্যে আছে তাদের প্রতি (ছোটবেলায় বিএনজিএস অর্থাৎ, বিলেতে না গিয়ে সাহেব কথাটি শুনেছি)। 'একুশে আইন-এ তা দমনমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি, আর 'হ য ব র ল'-তে বিচার ও আইনব্যবস্থার প্রতি উদ্দীষ্ট। আবার, 'সৎ পাত্র'-এ ব্যঙ্গের লক্ষ্য সমাজে পারিবারিক পরিচিতি ও জাতপাতের গুরুত্ব নিয়ে গর্ব করার প্রবণতা ('কিন্তু তারা উচ্চ ঘর/ কংসরাজের বংশধর!/ শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের/ কী যেন হয় গঙ্গারামের।')। আর, তার সঙ্গে বিয়ের বাজারের করুণ অবস্থা নিয়েও মজা

করা হয়েছে, যেখানে গঙ্গারামের মতো কেউ সুপাত্র বলে পরিগণিত হতে পারে! 'রামগরুড়ের ছানা'-তে যারা গাম্ভীর্যকে চারিত্রিক গুণ বলে মনে করে এবং হাসিঠাট্টাকে লঘু বিষয় মনে করে। এখানে মনে রাখতে হবে, এই মতবাদ নিয়ে একটি দার্শনিক ধারা আছে, যার সূচনা প্লেটো থেকে। হাসি তাঁদের কাছে মনুষ্যচরিত্রের লঘু একটি প্রবৃত্তি, যা আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাবের লক্ষণ। আবার কেউ কেউ (তাঁদের মধ্যে অ্যারিস্টটল আছেন) মনে করতেন, হাস্যরস আসলে দম্ভ ও অবজ্ঞার অভিব্যক্তি। প্লেটো এ-ও মনে করতেন, হাস্যরস মানুষকে শাসক আর প্রতিষ্ঠানের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল করে তোলে, যদিও সেটা মন্দ না ভালো তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। প্লেটো যাকে হাস্যরসের একটা ত্রুটি বলে দেখেছিলেন, আধুনিক গণতান্ত্রিক চোখে সেটাকেই উল্টে গুণ হিসেবে ভাবা যায়, যে প্রসঙ্গে আমরা পরে ফিরে আসব। অন্য অনেক ছড়ায় খোঁচাটা কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতি নয়, মনুষ্যস্বভাবের বিচিত্র রকমফের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র। যেমন, 'কিম্ভূত!' ছড়াটি পড়ে (এবং তার সঙ্গে কবির আঁকা ছবিটি দেখে) প্রাথমিক যে মজা লাগে তা তার আজগুবি কল্পনার বিশুদ্ধ অভিব্যক্তিতে। পরে পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে, হয়তো যারা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়, এখানে সে রকম খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোকেদের নিয়ে মজা করা হয়েছে: 'মাঠপারে ঘাটপারে কেঁদে মরে খালি সে,/ ঘ্যান্ ঘ্যান্ আবদারে ঘন ঘন নালিশে।/ এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না/ কি যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না।' সর্বগুণসম্পন্ন হতে চাওয়া তো উত্তম ব্যাপার কিন্তু সব ইচ্ছেপূরণ হলে যে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে রীতিমতো অস্তিত্বগত সঙ্কট হয়ে দাঁড়াতে পারে, ছড়াটিতে তার প্রতি তির্যক ইঙ্গিত আছে: 'নই ঘোড়া, নই হাতি, নই সাপ বিচ্ছু,/ মৌমাছি প্রজাপতি নই আমি কিচ্ছু।/ মাছ ব্যাঙ গাছপাতা জলমাটি ঢেউ নই,/ নই জুতা নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই!' 'হ য ব র ল'-র ন্যাড়ার সেধে সেধে গান শোনানোর প্রবণতা, বা 'গানের গুঁতোয়' ভীষ্মলোচন শর্মার গানের অত্যাচারে সবার ব্যতিব্যস্ত হওয়া, বা 'লড়াই ক্ষ্যাপা'র 'সাত জার্মান, জগাই একা, তবুও জগাই লড়ে।' আবার 'কাতুকুতু বুড়ো' তাঁর বিদঘুটে গপ্পো শুনে না হাসলে কাতুকুতু দিয়ে হাসিয়েই ছাড়বেন, যেন টিভিতে সিটকম বা কমেডি শো-তে রেকর্ড করা অট্টহাসি বাজিয়ে হাসানোর চেষ্টার মতো। এগুলো পড়লে আমাদের পরিচিত কিছু মুখ মনে পড়ে যায়, তাই এই চরিত্রগুলো এখন কিংবদন্তির চরিত্রদের মতোই আমাদের ভাষার এবং সমষ্টিগত কল্পনাজগতের অঙ্গ হয়ে গেছে। আবার 'আবোল তাবোল' আর 'হ য ব র ল'-র অনেক চরিত্র এমন কিছু প্রবণতার নিখুঁত ব্যঙ্গচিত্র, যা আমাদের সবার মধ্যেই কমবেশি আছে অর্থাৎ মজাটা সেই প্রবণতাগুলো নিয়েই, কোনও বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তিত্বের আদলকে নিশানা করে নয়। 'বাবুরাম সাপুড়ে'-তে সাপ পোষা চাই কিন্তু তাকে হবে নেহাতই নিরীহ! বা 'নারদ!

চারপাশের জগতের নানা আজব কাণ্ডকারখানা দেখে কেউ যেন আপনমনে ফিক ফিক করে হেসে যাচ্ছে, 'রাজার অসুখ' গল্পের সেই পাগলটির মতো।

নারদ!'-এ তুচ্ছ জিনিস নিয়ে তর্ক করা চাই কিন্তু হাতাহাতির দিকে গড়ালেই চটপট মিটমাট করে নিতে হবে! এটা যেন পাড়ার ছেলেদের ভাষায় মিউচুয়াল করে নেওয়া। মনে আছে ছোটবেলায় একটি ঝগড়ার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে অভিজ্ঞতা। পাড়ার একটি রোগামতো ছেলে এক বলবান ব্যক্তির সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে হুঙ্কার দিচ্ছে 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমাকে...' আর ফিসফিস করে তার স্যাঙাৎদের বলছে 'ছাড়িস না, ছাড়িস না কিন্তু!' এই তালিকা আরও অনেক বাড়ানো যায়, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হলো প্রিয় কিছু রম্যরচনার উদাহরণ ধরে, কৌতুক কখন কাকে হাসায়, কখন কারও মনে হয় 'আমার হাসি পাচ্ছে না' (এই শিরোনামে সম্প্রতি একটি বই বেরিয়েছে, সেই প্রসঙ্গে আসছি।)[২], কখন তা বৃহত্তর রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিসরে বিতর্ক সৃষ্টি করে, এগুলো বুঝতে চেষ্টা করা। তবে লেখাটি সাহিত্য-সমালোচনা বা গবেষণার আতসকাচে না দেখে একজন অনুরাগী পাঠকের প্রিয় কিছু লেখার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া হিসেবে গল্পগুজব করার আমেজে নেওয়াই ভালো।

।২।

সুকুমার রায়ের জগৎ খানিকটা চিরকিশোর জগৎ— চারপাশের জগতের নানা আজব কাণ্ডকারখানা দেখে কেউ যেন আপনমনে ফিক ফিক করে হেসে যাচ্ছে, 'রাজার অসুখ' গল্পের সেই পাগলটির মতো, যাকে 'হাসছ কেন' জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিয়েছিল: 'হাসব না? পৃথিবী বন বন করে ঘুরছে, গাছের ছায়া সরে সরে যাচ্ছে, মাঠে মাঠে ঘাস গজাচ্ছে, রোদ উঠছে, বৃষ্টি পড়ছে, পাখিরা গাছে এসে বসছে, আবার সব উড়ে যাচ্ছে। এ-সব চোখের সামনে দেখছি আর হাসি পাচ্ছে!' তাঁর জগতে পরিচিত দৃশ্যাবলি ও চরিত্র মিশিয়ে নানা রম্যচিত্র ভেসে ওঠে, সেখানে আমাদের পরিচিত পৃথিবীর মিল থাকলেও, সেটা মূলত তাঁর কল্পনার জগৎ, চিড়িয়াখানার মতো তাতে বিচিত্র নানা মানুষ ও প্রাণীর দেখা মেলে। এমনকী যেখানে তাঁর ছড়ায় সমকালীন বাস্তবের ইঙ্গিত স্পষ্ট, সাহেবিয়ানা ('ট্যাঁশ গরু') বা স্বৈরতান্ত্রিক আইন ('একুশে আইন')— সেখানেও কৌতুকটা শেষ পর্যন্ত বাস্তবের মাটি ছেড়ে ভেসে যায় কল্পনার এক আজগুবি, খানিকটা অধরা জগতে। তুলনায় পরশুরামের জগৎ ঘোরতর বাস্তব পৃথিবীতে প্রোথিত। তাতে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, দেশ-বিদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলি থেকে শুরু করে প্রেম-বিবাহ, বন্ধুদের মধ্যে বা পরিবারের মধ্যে নানা সম্পর্কের টানাপড়েন থেকে তিনি তাঁর রম্যরস আহরণ করেন। এখানে মনে রাখতে হবে সুকুমার রায়ের অকালমৃত্যু হয় ১৯২৩ সালে, তখনও তাঁর ছত্রিশ বছর সম্পূর্ণ হয়নি। আর রাজশেখর বসু পরশুরাম ছদ্মনামে প্রথম যখন গল্প প্রকাশ করেন ১৯২২ সালে, তখন তাঁর বিয়াল্লিশ বছর বয়স, যদিও তিনি সুকুমার রায়ের থেকে বছর সাতেকের

বড়। তার আগে বেঙ্গল কেমিক্যালে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন কেটে গেছে, তাই তাঁর জীবন ও কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি প্রচুর রসদ আহরণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি একজন মধ্যবয়স্ক, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, নগরবাসী, কিছুটা উদারচেতা বাঙালি পুরুষের এবং তাঁর লেখার মূল আকর্ষণ হলো আপাতগম্ভীর গদ্যের ফাঁকে কৌতুকের বিদ্যুচ্চমক। সুকুমার রায়ের মতো তিনিও অনেক ধরনের চরিত্রের ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন, তবে তাঁর চরিত্রগুলি একেবারেই আজগুবি বা খামখেয়ালি নয়, তাদের বাস্তব পৃথিবীর মানুষ হিসেবে ভাবতে অসুবিধে হয় না। তাঁর চরিত্রায়নের মধ্যে সহানুভূতি আছে, আবার সমালোচনাও আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁরা আমাদের পরিচিত মানুষের মতো হয়ে ওঠেন, দোষগুণ মিলিয়ে তাঁদের প্রতি এক ধরনের সহমর্মিতা জন্মে ওঠে— অম্লরস এখানে মূলত সুস্বাদু। ব্যতিক্রম হলো 'বিরিঞ্চিবাবা' এবং 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এ ক্ষমতাশালী ভণ্ড এবং অসৎ লোকেদের চরিত্রায়নে— সেখানে তাঁর কলম থেকে নিঃসৃত কালিতে মিশেছে অ্যাসিডের জ্বালা। পেশায় রসায়নবিদ বলেই হয়তো তাঁর পক্ষে অম্লরসের নানা বিচিত্র মিশ্রণ অনায়াসে করা সম্ভব হয়েছে।

এই লেখার ক্ষুদ্র পরিসরে, তাঁর প্রায় শ'খানেক গল্পের যে মহাবৈচিত্রময় ও প্রাণবন্ত জগৎ, তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ নিয়েও সম্যক আলোচনা করা অসম্ভব। এখানে আমি শুধু একটিই বক্তব্যের ওপর মনোনিবেশ করব। তাঁর গল্পগুলিতে যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে, তাতে আপাত দৃষ্টিতে তাঁর রসিকতার নিশানায় 'অপর' বা 'উৎকেন্দ্রিক' কে বা কারা ভাবতে গেলে এক ধরনের রক্ষণশীলতা চোখে পড়তে পারে। কিন্তু তাঁর গল্পগুলো মন দিয়ে পড়লে বোঝা যায় ব্যাপারটা অতটা সরল নয়। যেমন, তাঁর গল্পে পুরুষ ও নারীর সম্পর্কে কিছু গতানুগতিক রক্ষণশীল ছকের ছায়া পাওয়া যেতে পারে। 'চিকিৎসা সংকট'-এ বিপুলা দেবী ও নন্দবাবুর সম্পর্ক বা 'রাতারাতি' গল্পে জিগীষা দেবী ও তাঁর স্বামী সুষেণবাবুর সম্পর্ক প্রথাগত ছাঁচের বাইরে। যেখানে স্ত্রী-রা হলেন ব্যক্তিত্ববতী এবং স্বাধীন (যদিও, বিয়ের পরে বিপুলা দেবী পেশাদারি ডাক্তারি ছেড়ে শুধু তাঁর স্বামী নন্দবাবুরই চিকিৎসা করতেন) এবং স্বামীরা খানিকটা স্ত্রৈণ এবং ব্যক্তিত্বহীন। যেমন, 'চিকিৎসা সংকট' গল্পের শুরুতেই নন্দবাবুকে 'নিরীহ গোবেচারা অল্পভাষী উদ্যমহীন আরামপ্রিয় লোক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর 'রাতারাতি' গল্পে জিগীষা দেবীর স্বামী সুষেণবাবুর বর্ণনা হলো 'রোগা, বেঁটে, চোখে চশমা, মাথায় টাক, কিন্তু গোঁফ জোড়াটি বেশ বড় এবং মোম দিয়া পাকানো। সতী সাধ্বী যেমন সর্বহারা হইয়াও এয়োতের লক্ষণ শাঁখা জোড়াটি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে, বেচারা সুষেণবাবুও তেমনি সমস্ত কর্তৃত্ব খোয়াইয়া পুরুষত্বের চিহ্ন স্বরূপ এই গোঁফ জোড়াটি সযত্নে বজায় রাখিয়াছেন।' এই দু'টি গল্পে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণে তাঁর খানিকটা গতানুগতি ধারার প্রতি পক্ষপাত আছে বলে মনে হতেই পারে, কারণ



তাঁর চরিত্রায়নের মধ্যে সহানুভূতি আছে, আবার সমালোচনাও আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁরা আমাদের পরিচিত মানুষের মতো হয়ে ওঠেন

সেটা পাল্টে দিয়ে তিনি মজাটা করেছেন। ভূমিকাগুলো যদি উল্টে যেত, তা হলে মজার তেমন কিছু থাকত না। আবার সামাজিক ভাবে মূলধারার বাইরে যাঁরা, তাঁদের নিয়ে 'কচি-সংসদ'-এ (যথা, লালিমা পাল, পুং) যে মজা করা হয়েছে, তা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে আপত্তি উঠতেই পারে। তা হলেও গল্পগুলোয় তাঁর কৌতুকের খোঁচা থেকে কেউই কিন্তু পার পান না— তার মধ্যে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে তাঁর মতো মানুষেরা, অর্থাৎ শিক্ষিত, চাকুরিজীবি, মধ্যবিত্ত, সংসারী বাঙালি পুরুষেরাও অবশ্যই আছেন। শুধু তা-ই নয়, ক্ষমতার পাল্লা যাঁদের দিকে বেশি ঝুঁকে আছে, তাঁদের দোষগুলোর ওপর তিনি বিশেষ ভাবে ধারালো তির চালিয়েছেন। অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়, দু'টি উদাহরণ দিই, তাঁর দু'টি গল্প থেকে। 'ষষ্ঠীর কৃপা' গল্পে মেনকা, যে আসলে মাজারী, সে গোকুলবাবু, যিনি তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছেন, তাঁকে উচিত শিক্ষা দেয়। শুধু তা-ই নয়, গোকুলবাবুর সঙ্গে ঝগড়ায় মেনকা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ নিয়ে একটি ছোট ভাষণও দেয়! 'দ্বান্দ্বিক কবিতা' গল্পে ধূর্জটি যখন বুঝল মানসী প্রিয়ার সঙ্গে তার বিবাহিত প্রিয়া শংকরীর কোনও মিল নেই, সে তার কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে চুটিয়ে কবিতা লিখতে লাগল। গল্পটিতে মোড় আসে যখন শংকরীর বান্ধবী বিশাখার উস্কানিতে শংকরীও অচেনা পুরুষদের প্রতি প্রেম ও বাসনার অভিব্যক্তি মিশিয়ে কবিতা লেখা শুরু করল এবং সেগুলো পাঠক ও সমালোচক মহলে প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠল। লেখকের ভাষায়: 'কাঙ্ক্ষার ঝংকার' নাম দিয়ে শংকরীর একটা কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হলো, তিন মাসের মধ্যেই তিনটে সংস্করণ ফুরিয়ে গেল। ধূর্জটি নিজের রচনা নিয়েই মেতে থাকত, তার বৌ কি লিখছে, তা পড়ে লোকে কী বলছে, এ সব খবর রাখত না। একদিন তার এক সাহিত্যিক বন্ধু একখানা 'কাঙ্ক্ষার ঝংকার' দেখিয়ে বলল, 'ওহে ধূর্জটি, এই শংকরী দেবী তোমারই গৃহিণী তো? ওঃ, ভদ্রমহিলা কি সব অদ্ভুত কবিতা লিখছেন, রেগুলার হট স্টফ। পড়ে তোমার মনে একটু ইয়ে হয় না?' গল্পের শেষ এই ভারসাম্যে, যেখানে দু'জনেই কবিতা লেখা বন্ধ করছে। শংকরীর কবিতা লেখা বন্ধ করা রক্ষণশীল ঝোঁকের ইঙ্গিত বলে ভাবা যেতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, ধূর্জটিও কবিতা লেখা বন্ধ করল। তাই, এখানে লেখকের ব্যঙ্গের লক্ষ্য লিঙ্গভিত্তিক দ্বৈত মাপকাঠি— যদি বিবাহিত পুরুষ পরনারীর প্রতি আকুল উচ্ছ্বাসে কবিতা লিখতে পারেন, তা হলে একজন বিবাহিত নারী পারবেন না কেন? দুই ক্ষেত্রেই লেখকের রসিকতার তির ভারসাম্য থেকে বিচ্যুতি নিয়ে এবং সেখানে কারও আচরণে আধিক্য বা অন্যের প্রতি সহানুভূতির অভাবের প্রতি, সেখানে তিনি কোনও পক্ষপাত দেখাননি। অবশ্যই তিনি তাঁর সময়ের প্রচলিত ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত, আমরা সবাই-ই কমবেশি তা এবং তার প্রতিফলন তাঁর

খবরাখবর

সংবাদপত্র ও পত্রিকা পাওয়া যায়

এবং এখানে সরকারি **Gazette** সহ সমস্ত
সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়।





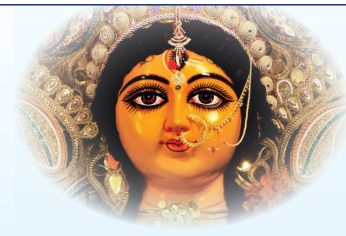
- সরকারি নোটিফিকেশন
- আইন ও বিধি
- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
- বিভিন্ন সরকারি বিজ্ঞপ্তি

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি সদন কমপ্লেক্স
দিনহাটা, কোচবিহার।

মোঃ | 8972813800 / 9832347451

Shreemaa

97497 97970
82504 50521



শারদীয়া শুভেচ্ছা

Shreemaa Weighing Scales

[Approved Dealer by the Directorate of Legal Metrology Govt. of West Bengal]

Deals with electronic Weighing Machines
Wholesale and Retail





Caltex More, Near Ankur School, Malbazar
Godown : Ektiasal Hut, Siliguri, Dist. Jalpaiguri

Successfully installed One Ton weight machine with VRL logistics by Shreemaa Weighing Scales

চরিত্রায়নে পড়েছে। কিন্তু তাঁর সময়ের যে সামাজিক ভারসাম্য, তা তো আর অনড় অক্ষয় নয়। তাই, আধুনিক দৃষ্টিতে দেখলে মনে হতেই পারে এখন লেখা শুরু করলে পরশুরামের কুঠার অন্য অনেক নিশানা খুঁজে পেত।

।৩।

সাহিত্যের জগৎ থেকে এবার ফেরা যাক বাস্তব জগতে। ক্ষমতা ও হাস্যরসের সম্পর্ক নিয়ে প্রথম ভাবতে শুরু করি ছাত্রজীবনে র‍্যাগিং নিয়ে বিতর্কে, যদিও বলে রাখা ভালো, সেখানে হিংসাত্মক কোনও ঘটনা ঘটত না। বন্ধুদের মধ্যে কাউকে নিয়ে মজা করা বা খেপানোর বা ক্যান্টিনে কয়েকজন মিলে উদ্ভট কোনও স্কিট ফাঁদা, এ সব ব্যাপারে আমরা কয়েকজন যারা ছিলাম খানিকটা পালের গোদা ধরনের, তাদের মধ্যে র‍্যাগিং নিয়ে প্রবল মতভেদ হলো। প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে আমার নিজের ভালো লাগেনি অভিজ্ঞতাটা, তাই আমি আর কয়েকজন ঠিক করেছিলাম, পরের বছর যখন আমাদের সুযোগ আসবে, আমরা র‍্যাগিং করব না। একজন আমায় প্রশ্ন করেছিল, ক্যান্টিনে আমি আমার ব্যাচের একটি ছেলের সঙ্গে একদিন যে মজাটা করছিলাম, সেই একই মজা র‍্যাগিংয়ে হলে অসুবিধে কী? আমার উত্তর ছিল, সে বা অন্যরা তো উল্টে আমাকে নিয়েও মজা করতে পারে! জোর করে একদল অপরিচিত লোকেদের সামনে কাউকে নিয়ে, যে অপরিচিত পরিবেশে এমনিতেই খানিকটা অস্বচ্ছন্দ হয়ে আছে, একই ধরনের মজা করাটা (যেমন, খুব পড়ুয়া গম্ভীর কোনো ছাত্র যার গলায় সুর নেই তাকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে কোনও জনপ্রিয় গান গাওয়ানো) আলাদা ব্যাপার। একই ধরনের মজা, এক ক্ষেত্রে হাসি পায়, এক ক্ষেত্রে কেন পায় না, এই নিয়ে পরে আরও ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছিল অন্যদের হাসানোর জন্যে কারও ওপর জোরজবরদস্তি করা হলে তা আর হাসির ব্যাপার থাকে না— কারণ বাকিদের আমোদের পাশাপাশি যে এই রসিকতার লক্ষ্য, তার অপ্রতিভতা, অপমান, কষ্ট, এবং স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়ার স্বাধীনতা না থাকা, এই দিকগুলোও থেকে যায়। এখানে অম্লরসটা স্পষ্টতই অ্যাসিডের মতো ঝাঁঝালো, যার প্রতি প্রয়োগ করা



▲ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হচ্ছে তাকে আহত করতে পারে।

তার পর আমার মেয়েরা যখন ছোট, তখন তাদের মজার গল্প পড়ে শোনানো বা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বা নেহাতই বানিয়ে বলা গল্প বলার সময় মনে হয়েছিল, রসিকতার লক্ষ্য যখন কারও কোনও অক্ষমতা বা অসামর্থ্য, সে শারীরিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত হোক, সেখানেও হাসির উল্টো পিঠে আছে এক ধরনের উন্নাসিকতা এবং সহমর্মিতার অভাব (অ্যারিস্টটল বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুককে ‘শিক্ষিত ঔদ্ধত্য’ বলে উল্লেখ করেছেন)। এমন কাউকে তার সামনে এ সব নিয়ে মজা করা তো র‍্যাগিংয়ের মতোই নিষ্ঠুর, কিন্তু তার আড়ালেও সেগুলো নিয়ে হাসাহাসি করা আসলে ক্ষমতার অসাম্য নিয়ে বড়াই করা— অম্লরস এখানে কিছু লোকের জন্য আপাত ভাবে মুখরোচক হলেও, তার ভেতরে আছে অ্যাসিড।

ক্ষমতাশালী নয়, কৌতুকের তির যখন নেহাতই ‘অপর’ কোনও গোষ্ঠীর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তা যতই বুদ্ধিদীপ্ত হোক, সবার যে হাসি পাবে না তা বোঝা শক্ত নয়। কে ‘অপর’ তা নির্ভর করছে, যিনি রসিকতা করছেন তাঁর সামাজিক অবস্থানের ওপর। আমাদের ছোটবেলায় সর্দারজিদের বুদ্ধি নিয়ে সান্টা-বান্টা গোছের রসিকতা খুব চালু ছিল। তবে ‘অপর’ মানেই যে সব সময় প্রান্তিক কোনও গোষ্ঠী হতে হবে, তা নয়। অনেক চালু রসিকতার লক্ষ্য হলো, যাঁরা আর্থ-সামাজিক ভাবে অনগ্রসর, তাঁদের প্রতি (যেমন, গ্রাম থেকে আসা কারও উচ্চারণ বা বেশবাস নিয়ে হাসা), যদিও জনসংখ্যার অনুপাত হিসেবে তাঁরা সংখ্যালঘু নন। আবার নারীদের নিয়ে নানা প্রচলিত রসিকতা আছে, যার প্রতিক্রিয়ায় কেউ যদি বলেন ‘আমার হাসি পাচ্ছে না’, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। যে রসিকতাটা এই নামের বইটির নেপথ্যে আছে, তার সারমর্ম হলো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পেয়ে স্বামী তাঁর স্ত্রীর মগজের ক্ষমতাকে দশ গুণ বাড়িয়ে দিতে বলেন, যার উত্তরে আরবি রজনীর জিনি বলেন, শূন্যকে দশ

দিয়ে গুণ করলে শূন্যই থাকে। এখানে মানবসভ্যতার আধা শরিক নারীদের যে ভাবে নেতিবাচক বাঁধা গতে (negative stereotype) ফেলা হয়েছে, যার কোনও ভিত্তি নেই শুধু তা নয়, তার মধ্যে এক ধরনের মূঢ় অহঙ্কার কাজ করছে, এই রসিকতা যাঁরা করেন বা এতে যাঁরা হাসেন, তাঁদেরও গৌরব বাড়ে না। অর্থাৎ, এখানেও অম্লরসে অ্যাসিডের ঝাঁঝ এসে যায়। তার মানে কি এ রকম রসিকতা কখনওই সবাইকে হাসায় না? কলকাতায় বসে বাঙালিদের বাস্তববুদ্ধি বা কর্মোদ্যোগ নিয়ে আমি যদি রসিকতা করি, তা হলে তা মজার হতে পারে, কারণ আমি নিজে বাঙালি, কিন্তু দিল্লিতে একই রসিকতা অন্য প্রদেশের কেউ করলে, তখন অতটা হাসি পায় না। কিন্তু বিদ্রুপের তির যদি ক্ষমতাশালী কারও প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়? তবে নিশ্চয়ই তা এর আগের উদাহরণগুলোর তুলনায় নৈতিক দিক থেকে সমর্থনীয়, যে হেতু রসিকতার তির ক্ষমতার স্তরবিন্যাসে নীচ থেকে ওপরে ছোঁড়া হচ্ছে। জর্জ অরওয়েল ১৯৪৫ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে যখন বলেছিলেন 'Every joke is a tiny revolution', তিনি এই গোত্রের ব্যঙ্গ বা উপহাসের কথা বলছিলেন।[৩] কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া হলো, যিনি রসিকতা করছেন তাঁর ওপর রাষ্ট্রযন্ত্রের শাস্তির খাঁড়া নেমে আসতে পারে।

সাহিত্যে এর উদাহরণ হিসেবে মিলান কুন্দেরার 'দ্য জোক' উপন্যাসের কথা মনে করা যেতে পারে। পাঁচের দশকে কমিউনিস্ট চেকোস্লোভাকিয়ায় এক তরুণ লুদভিক তার কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শে আন্তরিক বিশ্বাসী বান্ধবীকে উদ্দেশ করে লেখা একটা পোস্টকার্ডে একটি রসিকতা করে, যার মর্মার্থ হলো 'আশাবাদ হলো জনগণের আফিম', যা মার্ক্সের ধর্ম নিয়ে বিখ্যাত উক্তিটির কিঞ্চিৎ রূপান্তর। এর ফলে সে কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়ে এবং তাকে নানা রকম শাস্তি ভোগ করতে হয়। সেটা গল্প ছিল, সেই জমানা আর নেই, তবুও ইতিহাসে বা এখনও এ রকম উদাহরণ প্রচুর। সাম্প্রতিক কালে কৌতুকশিল্পীদের সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়ার উদাহরণ হিসেবে আমাদের দেশে মুনাওয়ার ফারুকি, কুনাল কামরা ও বীর দাস আর অ্যামেরিকায় ট্রাম্প জমানায় টিভির কমেডি শো হোস্ট জিমি কিমেল বা স্টিফেন কোলবেয়ারের কথা মনে করা যেতে পারে। অম্বিকেশ মহাপাত্রের কথাও এখানে প্রাসঙ্গিক, যাঁকে ২০১২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র শেয়ার করার অপরাধে জেলে যেতে হয়েছিল। সদ্যপ্রয়াত চিত্র-পরিচালক অনীক দত্তের 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবিটি নিয়ে বিতর্কের কথাও মনে পড়ে যেতে পারে, যাতে তৎকালীন শাসকদল ও তার নেতৃত্বকে (এবং আরও অনেক কিছু) নিয়ে অজস্র রঙ্গ-রসিকতা ছিল। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তির পরদিনই কলকাতার একাধিক প্রেক্ষাগৃহে হঠাৎ তার প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যায় কোনও সরকারি ব্যাখ্যা ছাড়াই অথচ ছবিটির সেন্সর ছাড়পত্র ছিল। শোনা যায়, স্থানীয় থানা থেকেই নাকি হল-মালিকদের কাছে সরাসরি নির্দেশ এসেছিল প্রদর্শনী স্থগিত রাখার জন্য। শেষমেশ কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপেই এপ্রিল মাসের গোড়া থেকে ছবিটি ফের হলে ফেরে। এই সব উদাহরণই মনে করিয়ে দেয়, ক্ষমতা আর হাস্যকৌতুকের অম্লরসের মিশ্রণে যে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হয়, তার ফলাফল অনিশ্চয়তায় ভরা। তাই হাসব না হাসব না, বা হাসাব না হাসাব না, এর মধ্যে সব সময়ে একটা ঝুঁকি থেকে যায়। কখনও তা সবারই মনোরঞ্জন করতে পারে, তখন এই মিশ্রণ যেন টকমিষ্টি চনমনে এক পানীয়। আবার কখনও তা অন্যকে অন্যায় আঘাত করতে পারে, যা প্রবল তিক্ততা সৃষ্টি করে। আবার কখনও তা ন্যায্য প্রতিবাদের অভিব্যক্তি হলেও, ক্ষমতাসীন কাউকে চটালে তার গুরুতর অভিঘাত, যিনি রসিকতা করেছেন তার ওপরে বিষবৎ হতে পারে।

তবু সব সময়ে কি তা হয়? এই প্রসঙ্গে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের একটা গল্প মনে করা যেতে পারে— বাদশা বেগুনভাজা খেয়ে একদিন মুগ্ধ হয়ে বলেন এমন সুস্বাদু জিনিস আর হয় না, নাসিরুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে সায় দেন, পরদিন সেই একই বেগুনভাজা খেয়ে বাদশার মেজাজ বিগড়ে গেলে নাসিরুদ্দিন আবার সমান তৎপরতায় সায় দেন। বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, কাল যা বলেছিলে আজ তার উল্টো বলছ কেন, নাসিরুদ্দিন জবাব দেন, 'জাঁহাপনা, আমি তো আপনার সভাসদ, বেগুনের নয়।' গল্পে আছে, বাদশা রেগে যাননি, হেসেছিলেন।

জীবনানন্দ দাশের 'সুবিনয় মুস্তাফী' কবিতা শুরু হচ্ছে: 'সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে।/ এক সাথে বেরাল ও বেরালের-মুখে-ধরা-ইঁদুর হাসাতে/ এমন আশ্চর্য শক্তি ছিলো ভূয়োদর্শী যুবার।' এখানে হয়তো কবির কল্পনা একটু বেশিই বেলাগাম, কিন্তু জীবননাট্যের অলীক ও উদ্ভট নানা পর্বে অবস্থাভেদে আমাদের ভূমিকা পাল্টায়, কখনও আমরা নিজেই হাসির লক্ষ্য, কখনও অন্যদের কথায় বা কাজে হাসি পায়। যিনি রসিকতা করছেন, রসিকতার লক্ষ্য যিনি বা যাঁরা, এবং যাঁরা শুনছেন, সবাই যদি একসঙ্গে হাসতে পারেন, তবেই হয়তো সেই রসিকতা সার্থক— রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা একটু বদলে বলা যেতে পারে, 'একাকী রসিকের নহে তো হাসি, হাসিতে হবে সবে মিলে'। যাঁরা নিজেকে নিয়ে হাসতে পারেন, তাঁদের আমরা পছন্দ করি বোধ হয় এই কারণেই যে, তাঁরা জানেন পাশা উল্টে গেলে আজ যিনি হাসাচ্ছেন, কাল তিনিই হতে পারতেন হাসির পাত্র। সেই রসিকতাই এই পরীক্ষায় সার্থক হয়, তাতে যিনি হাসাচ্ছেন, যাকে নিয়ে হাসা হচ্ছে, আর যাঁরা হাসছেন, তাঁদের ভূমিকাগুলো অদলবদল হয়ে গেলেও নেপথ্যে হাসির রেশটা থেকে যায়, আর এক রসসম্রাট লুইস ক্যারোলের 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের' অপস্রিয়মাণ চেশায়ার ক্যাটটির মতো। ■

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সৌরভ চট্টোপাধ্যায় ও সর্বজিৎ মিত্র কিছু প্রবন্ধ ও বই জোগাড় করে দিয়েছেন, যা সহজপ্রাপ্য নয়। অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ গুপ্ত ও সীমন্তিনী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। মনীষিতা দাশ অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।]

১. মূল ছড়ার বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

২. 'আমার হাসি পাচ্ছে না', সীমন্তিনী মুখোপাধ্যায়, হাতেখড়ি, ২০২৫

৩. Orwell, George. 'Funny, But Not Vulgar.' Collected Essays. New York: Harcourt, Brace & World, 1968, Volume III, 284–285.